

রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসংগীত

ও

শৈলজারঞ্জন

সম্পাদনা

অনুত্তমা ঘোষ

শমীক ঘোষ



অনুস্তুপ প্রকাশনী

২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

সূচি

সূচনা কথা/অনিল আচার্য	৯
ভূমিকা	১৩
প্রথম ভাগ : সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা	
অগ্নিরক্ষা/কিশলয় ঠাকুর	১৯
আত্মস্মৃতি/সাক্ষাৎকার: অরুণ ভট্টাচার্য	৮০
রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী/শৈলজারঞ্জন মজুমদার [অনুলিখন: গৌরী আইয়ুব]	৯৫
রবীন্দ্রনাথ ও শৈলজারঞ্জন/সাক্ষাৎকার: সুবিনয় রায়	১৩৪
কর্মযোগী শৈলজারঞ্জন/সাক্ষাৎকার: বুলবুল বসু	১৪৫
যাঁরা বিভিন্ন সাক্ষাৎকার গুলি নিয়েছেন তাঁদের পরিচিতি	১৭৫
দ্বিতীয় ভাগ : প্রবন্ধ ও বক্তৃতা	
মাঝি আমার, বোসো হালে/শৈলজারঞ্জন মজুমদার	১৮১
দুটি বক্তৃতা	
১। গুরুদেবের সঙ্গে কিছু কথোপকথন	১৮৬
২। রবীন্দ্রসংগীতের উত্তরাধিকার	১৯২
ব্যক্তি পরিচিতি : অক্ষরানুক্রমিক	২০৩
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	২৩৫

ভূমিকা

২০২৫ সালের ২০ জুলাই আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের একশো পাঁচিশ পূর্ণ হল। রবীন্দ্রসংগীতের এই অন্যতম গুরুর অবদান আজও অম্লান। রবীন্দ্রসংগীতকে বুঝতে হলে আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের দিকনির্দেশী লেখা এবং মতামতগুলি প্রণিধান করা অবশ্য প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হল।

আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদার রচিত প্রবন্ধ এবং তাঁর সম্বন্ধে রচিত প্রবন্ধগুলির সন্ধান করার সময়ে বিভিন্ন সময়ে নেওয়া তাঁর চারটি সাক্ষাৎকার আমার হাতে আসে তাঁর বিষয়ে আগ্রহী নানাজনের কাছ থেকে। এগুলিকে একটি বইয়ে প্রকাশ করার প্রস্তাব নিয়ে যখন অনুষ্ঠাপ প্রকাশনীর শ্রী অনিল আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করি, তখন তিনি সানন্দে সম্মত হন।

পাঠকরা হয়তো সাক্ষাৎকারগুলির মধ্যে কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবেন। সেগুলি আমরা অপরিবর্তিত রেখেছি, কারণ প্রত্যেকবার বলার সময় শৈলজারঞ্জন কিছু-না-কিছু সংযোজন করেছেন বা পরিপ্রেক্ষিতের বদল হয়েছে। শৈলজারঞ্জন প্রচারবিমুখ মানুষ ছিলেন, তাই তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায় না, যেমন স্বরলিপির প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে তাঁর মতামত বা সংগীতভবনের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তাঁর অভিজ্ঞতা। এই গ্রন্থটিতে তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত এবং কর্মক্ষেত্রের নানান দিক, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা উল্লিখিত হয়েছে তাঁর নিজের ভাষায়।

‘রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী’ শীর্ষকসহ প্রকাশিত শৈলজারঞ্জনের সাক্ষাৎকারটি প্রখ্যাত দার্শনিক ও লেখিকা শ্রীমতী গৌরী আইয়ুব দীর্ঘ সময় ধরে আর অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নিয়েছিলেন ১৯৮৩ সালে এবং এটি ২০২২-

এর ‘শারদীয়া বর্তমান’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শ্রী অতনু দত্ত মজুমদার সাক্ষাৎকারটির একটি প্রতিলিপি আমাকে পাঠান। ‘বর্তমান’ পত্রিকা এবং শ্রীমতী গৌরী আইয়ুবের পুত্রবধু ও পুত্র শ্রীমতী চম্পাকলি আইয়ুব এবং শ্রী পুষন আইয়ুব এই মূল্যবান সাক্ষাৎকারটি এই বইয়ে প্রকাশ করার জন্য সানন্দে অনুমতি দিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এটিতে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শৈলজারঞ্জনের বিভিন্ন সময়ের কথোপকথন, গান শেখার অভিজ্ঞতার কথা এবং সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব কী করে তাঁর ওপর এল তার বিবরণ।

এই বইয়ের শেষ সাক্ষাৎকারটি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাকে দিয়েছেন শৈলজারঞ্জনের সুযোগ্য ছাত্রী শ্রীমতী বুলবুল বসু। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। শ্রীমতী বুলবুল বসু এই সাক্ষাৎকারটি নেন ১৯৮৩-৮৪ সালে, তারপর থেকে এত বছর ধরে এটিকে সযত্নে একটি ক্যাসেটে রক্ষা করে এসেছেন—কারণ এই ব্যাপারে তাঁর গুরু শৈলজারঞ্জন তাঁকে বলেছিলেন, ‘আমার মৃত্যুর আগে এই সাক্ষাৎকার প্রকাশ করো না’। শ্রীমতী বসুর সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনার সঙ্গে তাঁর কর্মজীবনের অনেক অল্পমধুর স্মৃতি এবং স্বরলিপি প্রকাশ করার কাজের ব্যাপারে কিছু সমস্যার আলোচনা করেছেন অকপটভাবে। সংগীতভবনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনে যে তাঁকে বেশ কিছু বাধারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল তারও আভাস দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারটি ‘কর্মযোগী শৈলজারঞ্জন’ শীর্ষকসহ এই বইয়ে প্রকাশিত হল।

‘রবীন্দ্রসঙ্গীত ও শৈলজারঞ্জন’ শীর্ষক সাক্ষাৎকারটি ‘দেশ’ পত্রিকায় ১০ মে ১৯৮৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই সাক্ষাৎকারটি নেন শৈলজারঞ্জনের সুযোগ্য ছাত্র ও স্বনামধন্য গায়ক শ্রী সুবিনয় রায়। এখানে শৈলজারঞ্জন রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের শুদ্ধতা রক্ষার অতদূর প্রহরী শৈলজারঞ্জন আস্থা প্রকাশ করেছেন মানুষের শুভবুদ্ধির উপরে, কিন্তু আমরা কি তাঁর ভরসার যোগ্য হতে পেরেছি? এই সাক্ষাৎকারটি এই বইয়ে যুক্ত করার অনুমতি দিয়েছেন আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ এবং শ্রী সুবিনয় রায়ের পুত্র শ্রী সুরঞ্জন রায়। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

অগ্নিরক্ষা

কিশলয় ঠাকুর

[৭ই পৌষ ১৩৯১ বঙ্গাব্দে উদয়ন, শান্তিনিকেতন থেকে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকার নামপত্রে উল্লেখ—‘পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়কে/শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ/কর্তৃক সশ্রদ্ধ অর্ঘ্যদান উপলক্ষে/আচার্যের আশীর্ভাষণ/অগ্নিরক্ষা’। আর এই অগ্নিরক্ষা পুস্তিকার মূল লেখাটির শেষে আছে—‘কলকাতা সল্টলেক ভবনে বিভিন্ন তারিখে আচার্যের প্রতিভাষণ ও সংশ্লিষ্ট তথ্য: অনুলিখন—কিশলয় ঠাকুর’। কিন্তু লেখাটি পড়ে দেখলে বোঝা যায়, এটি অনুলিখন নয়। হয়তো শৈলজারঞ্জনের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কিশলয় ঠাকুর লেখাটি তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে দুঃপ্রাপ্য সেই লেখাটি এখানে দেওয়া হল।]

ছন্দোহয়ং সংগীতোহয়ম্—এ-জীবন ছন্দময়, এ-প্রাণ-গান। অন্তরে যাঁর এই ঋতমস্ত্র রণিত তাঁর অনিবার্য প্রব্রজন সেই গীতরসধারার উৎস সন্ধানে।

‘নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?—মহাদেবের জটা হইতে’। ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে সে ছিল এক বিজ্ঞানাচার্যর মানসযাত্রা। একালের এক বিজ্ঞানীমনও যাত্রা করেছিল তাঁর গীতগঙ্গোত্রীর উৎস সন্ধানে। বাহাম থেকে বোলপুর।

সিদ্ধির পথ সুগম হয়। প্রার্থিত মেলেনি প্রথম পদপাতেই। অতিথিশালায়ও ছিল না রবাহূত আগন্তকের জন্য আপ্যায়নের আয়োজন। বরং ছিল বাধা, কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা আর পত্রপাঠ প্রত্যাখানের প্রস্তুতি। শেষ পর্যন্ত অবশ্যই সিদ্ধি অর্জিত। উন্নতদর্শন সেই তীর্থগুরুর আশীর্বাদে হল অভিষেক। এবং সেই থেকে গুরুদেবের আদেশে তাঁর সংগীতসম্পদকে সকল ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে আরুণির মতো আগলে আছেন তিনি।

তিনি-শৈলজারঞ্জন মজুমদার। পিতৃপদবি দত্তমজুমদার। রমণীকিশোর-সরলাসুন্দরীর সাতপুত্রের জ্যেষ্ঠ শৈলজারঞ্জন। জন্ম চৌঠা শ্রাবণ, ইংরেজি উনিশশো সাল। ময়নসিংহের নেত্রকোনার ছোটোখাটো জমিদার পরিবার। গ্রামের নাম বাহাম। পরিবারে অর্থসংগতির সঙ্গে দৈন্য ছিল না শিক্ষা-সংস্কৃতিরও। অনুরূপ ছিল আত্মীয় পরিমণ্ডল। অতএব নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলে নির্বাধ জীবন। বাদ সাধেন বুঝি বিধাতাপুরুষ। আড়াল থেকে তিনি তাঁর বাঞ্ছিতকে টেনে নেন নির্বাচিত পথে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাঙ কান্দার বন্দ পেরিয়ে পাইকুড়া গ্রাম। ধানখেতের আল বেয়ে, পাটখেতে খেই হারিয়ে, গোসাঁইপাড়ায় পৌঁছানো। সেখানে ভৈরব গোসাঁইর বৈঠকখানায় হৃদয় পণ্ডিতের পাঠশালায় প্রথম পাঠ। কিন্তু পাঠ্য সে তো পথের পাশে পাশে আরও ছড়ানো বর্ণে গন্ধে ধ্বনিতো। ঝিল-ঝিলে ঝাঁপাই, নদী খালে নৌকো বাইচ, শালিক-দোয়েলের শিস নকল, তার চাইতেও ভালো লাগে হাটে মাঠে বাটে ছড়ানো এ জেলার বিশেষ সম্পদ লোকগীতির সঙ্গে গলা মেলানো। সেসব গানের কোনো বাছবিচার নেই। কীর্তন, বাউল, ময়নামতী, সারি, জারি, ভাটিয়ালি, গাজির গান বা শ্যামা সংগীত, ভজন কিংবা উচ্চাঙ্গ সংগীতেও অরুচি নেই। সহপাঠীরা বলত সুর-পাগলা। কিন্তু বাপ তো তাকে পাগল করতে পাঠাননি স্কুলে। চাকরি পর্যন্ত করেননি কেউ পরিবারে, জমিদারি আভিজাত্যে আঘাত লাগবে বলে। পিতা রমণীকিশোর ওই অঞ্চলে প্রথম বি.এ., বি.এল. ডাকসাইটে উকিল। তিনি শক্ত হলেন। একবার সুকণ্ঠের জন্য স্কুলের কোনো অনুষ্ঠানে সংস্কৃত স্তোত্র সুর করে গাইবার জন্য নির্বাচন করা হল শৈলজারঞ্জনকে। কিন্তু পিতৃদেবের অনুমতি পাওয়া গেল না কিছুতেই। তাঁর কথা, গানে মাতলে গোপ্লায় যাবে ছেলে।

ফলে আর উদাস্ত রইল না কণ্ঠ তাঁর। গান এল গুঞ্জে। সুরধারা[র] অন্তর্মুখী রাগসুরে শুধু রঞ্জিত হতে থাকল শৈলজারঞ্জনের সত্তা। সোচ্চার হয়েছেন কখনো-সখনো ঠাকুমার কাছে। তিনি লুকিয়ে প্রশ্ন দিতেন এই নাতিটিকে। শুনতেন ওর কাছে ঠাকুর-দেবতার গান কিন্তু ক্লাসের কৃতিত্বের কারণে সেটা তেমন ধরা পড়ত না অভিভাবকদের কাছে।